ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ১৩, সংখ্যা : ৪৯
জানুয়ারি-মার্চ : ২০১৭

ইসলাম ও প্রচলিত আইনে মালিক-শ্রমিক দ্বন্দ্ব নিরসন: একটি পর্যালোচনা

Settlement of Employer-Labor Dispute in Islam and Existing Law: An Analysis

Kamruzzaman Shamim*
Dr. A.K.M Muhibbullah**

ABSTRACT

History of Employer-Labor dispute is part of the ancient history of human society. To resolve this conflict, laws have been formulated in almost all countries of the world and the labor class have set up various organizations and institutions to represent their rights. International organizations such as the International Labor Organization (ILO), have been established to regulate the relationship between the employers and the workers. In Bangladesh too, law has been initiated with the target of taking care of the rights of employers and workers. In Bangladesh, the workers try to initiate various movements demanding reasonable payment, fixation of working hours and ensuring of a healthy working environment. On the other hand, employers try to dismiss workers' movements as incidents of disturbance and violence. As a result, there is a lack of effective steps for the development of relationship between employers and workers. In this situation, only Islamic law can resolve the dispute among them to ensure the rights of both the workers and owners. This article has provided an analysis of Islamic law and the law of Bangladesh to tackle employers and labors dispute following the analytical method. After that, evidence has been presented to prove that Islam is the most effective law to resolve this conflict.

Keywords: employer; laborer; labor dispute; settlement of dispute; employer-worker relationship.

* Dr. Kamruzzaman Shamim is an Assistant Professor in the Department of Arabic, University of Dhaka, email: shamimdu2@yahoo.com
** Dr. A.K.M Muhibbullah is a Lecturer in the Department of Islamic Studies, Asian University of Bangladesh, email: muhibasian2012@gmail.com

সারসংক্ষেপ

মালিক-শ্রমিক দ্বন্দ্বের ইতিহাস মানব সমাজের এক সুপ্রাচীন ইতিহাস। এ দ্বন্দ্ব নিরসনে পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই শ্রম নীতিমালা বা বিধি-বিধান প্রণীত হয়েছে এবং শ্রমিকশ্রেণি তাদের অধিকার আদায়ের জন্য বিভিন্ন সংগঠন গড়ে তুলেছে। আন্তর্জাতিকভাবেও মালিক-শ্রমিক সম্পর্কের ভারসাম্য রক্ষার নিমিত্তে International Labor Organization (ILO) এর মত বিভিন্ন শ্রম সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশেও মালিক ও শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার প্রাপ্তির লক্ষ্যে একটি আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধটিতে বর্ণনা ও বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতি অনুসরণ করার মাধ্যমে মালিক ও শ্রমিকের দ্বন্দ্ব নিরসনে বাংলাদেশের প্রচলিত আইন ও ইসলামের শাশ্বত বিধানের একটি পর্যালোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে। পাশাপাশি এ দ্বন্দ্ব নিরসনে ইসলামের কার্যকরী বিধানও তুলে ধরা হয়েছে। প্রবন্ধ থেকে প্রমাণিত হয়েছে, নানামুখী প্রচেষ্টা ও নীতি নির্ধারণের পরও ন্যায্য মজুরি প্রাপ্তি, কর্মঘণ্টা নির্ণয়ন, স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশ নির্ধারণের মত মৌলিক অধিকারগুলো নিশ্চিতকরণের দাবিতে প্রায়শই শ্রমিকরা আন্দোলন করে থাকে। পাশাপাশি মালিকগণ অস্থিরতা ও নৈরাজ্য সৃষ্টির অজুহাত দেখিয়ে নানা কৌশলে সেই আন্দোলন দমনে সচেষ্ট থাকে। ফলে মালিক ও শ্রমিকদের সম্পর্ক উন্নয়নে কার্যকরী ফলাফল পরিলক্ষিত হচ্ছে না। এমতাবস্থায় একমাত্র ইসলামের শাশ্বত বিধানই পারে মালিক ও শ্রমিকের অধিকার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে তাদের মধ্যকার দ্বন্দ্বের অবসান ঘটাতে।

মূলশব্দ: মালিক; শ্রমিক; শ্রম বিরোধ; বিরোধ নিষ্পত্তি; মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক।

উপক্রমণিকা

মানুষ সামাজিক জীব। আদিকাল থেকেই মানুষ সমাজবদ্ধভাবে বসবাস করছে। সমাজে অবস্থানগত দিক থেকে মানুষ দু' শ্রেণিতে বিভক্ত। এক শ্রেণির লোক ধন-দৌলত ও বিত্ত-বৈভবের মালিক; আরেক শ্রেণি হচ্ছে, যাদের নিজস্ব কোন ধন-সম্পদ নেই। তারা ধনী বা বিত্ত-বৈভবের অধিকারীদের অধীন হয়ে শ্রম বিনিয়োগের মাধ্যমে জীবন অতিবাহিত করে। সামাজিকভাবে উভয় শ্রেণি একে অন্যের উপর নির্ভরশীল এবং শান্তিপূর্ণ সমাজ বিনির্মাণে দু' শ্রেণিরই অবদান অপরিসীম। এ দু' শ্রেণির মাঝে ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় না থাকলে সমাজে নৈরাজ্য ও অস্থিতিশীলতা বিরাজ করে।

সমাজের শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার স্বার্থে এই দু' শ্রেণির শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান অপরিহার্য। কিন্তু আদিকাল থেকেই এই দু' শ্রেণির মাঝে এক ধরনের বিরোধপূর্ণ সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায়। মালিকশ্রেণি শ্রমিকশ্রেণিকে তাদের বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করছে এবং শ্রমিকশ্রেণিও জীবন-জীবিকার স্বার্থে ধনীশ্রেণির অধীনে তাদের শ্রম বিনিয়োগ করছে। পরিণামে মালিকশ্রেণি শ্রমিকশ্রেণির ন্যায্য অধিকার আদায়ে উদাসীন ও ব্যয়কুণ্ঠ থেকে যাচ্ছে, আর শ্রমিকশ্রেণি তাদের মৌলিক অধিকার আদায়ে নিরন্তর সংগ্রাম করে যাচ্ছে। সমাজের এই দু শ্রেণির পারস্পরিক অধিকার ও প্রাপ্তি নিশ্চিত করে বিরোধ নিষ্পত্তি না করতে পারলে দেশ ও জাতির সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভব নয়।

সমাজের এই দু শ্রেণির ন্যায্য প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে যুগে যুগে বিভিন্ন দেশে নানা রকম নীতিমালা ও বিধি-বিধান প্রণীত হয়েছে। বাংলাদেশেও বিভিন্ন সময়ে

বিভিন্ন নীতিমালা বিধিবদ্ধ হয়েছে। সর্বশেষ ২০০৬ সালে বাংলাদেশ শ্রম আইন নামে একটি পূর্ণাঙ্গ শ্রম বিধান প্রণয়ন করা হয়েছে। তারপরও শ্রম অসন্তোষ বা অধিকার আদায়ের নামে শ্রম আন্দোলন লেগেই রয়েছে। সমাজকে শান্তিপূর্ণ ও স্থিতিশীল করার লক্ষ্যে এ সকল অসন্তোষ ও আন্দোলনের চির অবসান অপরিহার্য। ইসলামের শাশ্বত বিধানের মাধ্যমেই একমাত্র সমাজের স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনা সম্ভব। তাই আলোচ্য প্রবন্ধে বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ ও ইসলামের বিধানের একটি পর্যালোচনা উপস্থাপিত হয়েছে এবং ইসলামের বিধানের আলোকে এ বিষয়টির সুরাহা করার চেষ্টা করা হয়েছে।

মালিক ও শ্রমিকের পরিচয়

মালিক শব্দটি মূলত আরবি। এটি বাংলা ভাষায় বিদেশি শব্দরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। আরবি রূপ হচ্ছে, "مالك" (মালিকুন)। এর অর্থ প্রভু, মালিক, কর্তা, অধিপতি, শাসনকর্তা ইত্যাদি (Mustafa 1989, 2/886; Rahman 2009, 862; Haque 2011, 981)। যেমন আল-কুরআনে এসেছে, ﴿ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴾ "যিনি বিচার দিবসের প্রভু" (Al-Qura'n: 1: 3)।

শ্রমিক বাংলা শব্দ। এর অর্থ হচ্ছে, মজুর; যে শরীর খেটে খায়; শ্রমজীবী; মেহনতী মানুষ ইত্যাদি (Haque 2011, 1091)। ইংরেজিতে এর প্রতিশব্দ হচ্ছে "Labour"। অর্থ হচ্ছে, ১. শারীরিক বা মানসিক শ্রম: ২. কর্ম; দায়িত্ব: ৩. শ্রমিক ইত্যাদি (Siddiqi, 2005, 427)। আরবি ভাষায় শ্রমিক বুঝাতে "عامل" ('আমিল) শব্দটি ব্যবহৃত হয়। এর বহুবচন হচ্ছে, "عمال" ('উম্মাল)। যেমন বলা হয়, "عمل، يعمل، عملا" ('আমিলা, ইয়া'মালু, 'আমালান) অর্থাৎ করা; কাজ করা; আচরণ করা; তৈরি করা; আমল করা; সৎকর্ম করা ইত্যাদি (Mustafa 1989, 2/628; Rahman 2009, 712)। যেমন কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হয়েছে:

﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴾

যে সৎকর্ম করে সে তার কল্যাণের জন্যেই তা করে এবং কেউ মন্দ কর্ম করলে এর প্রতিফল সেই ভোগ করবে, অতঃপর তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে (Al-Qura'n: 45: 15)।

ইসলামী ফকীহগণের মতে শ্রমিক হচ্ছে:

العامل من يشارك بجزء من الإنتاج أو الربح.

শ্রমিক হচ্ছে ঐ ব্যক্তি, যে উৎপাদন বা কোন লাভের অংশের সাথে শরীক থাকে (Al-Bahūtī N.D., 2:346)।

বাংলাদেশের শ্রম আইনে শ্রমিকের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে:

শ্রমিক অর্থ শিক্ষাধীনসহ কোন ব্যক্তি, তার চাকুরীর শর্তাবলী প্রকাশ্য বা উহ্য যে ভাবেই থাকুক না কেন, যিনি কোন প্রতিষ্ঠানে বা শিল্পে সরাসরিভাবে বা কোন ঠিকাদারের মাধ্যমে মজুরি বা অর্থের বিনিময়ে কোন দক্ষ, অদক্ষ, কায়িক, কারিগরী, ব্যবসা উন্নয়নমূলক অথবা কেরানীগিরির কাজ করার জন্য নিযুক্ত হন, কিন্তু প্রধান: প্রশাসনিক বা ব্যবস্থাপনামূলক কাজে দায়িত্বপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি এর অন্তর্ভুক্ত হবেন না (The Bangladesh Labour Code 2006, sec. 2/65)।

সর্বোপরি কোন কারখানায় যিনি বা যারা নিজ শরীরের শ্রম দিয়ে উৎপাদন অথবা কেরানী সংক্রান্ত কাজ করেন তিনি বা তারা সকলেই শ্রমিক।

শ্রমের প্রকারভেদ

ক. শারীরিক বা কায়িক শ্রম: শারীরিক বা কায়িক শ্রম বলতে বোঝায়, শরীর বা দেহকে খাটিয়ে যে শ্রম সরবরাহ করা হয়। কায়িক শ্রম হলো মানুষের পুঁজিবিহীন জীবিকার আসল মাধ্যম। যেমন দিন মজুরি, শিল্প ও কল-কারখানায় কাজ ইত্যাদি।

খ. শৈল্পিক শ্রম: শৈল্পিক শ্রম বলতে বোঝায়, যে কাজে শিল্প ও কৌশল বিদ্যাকে অধিক পরিমাণে খাটানো হয়। যেমন অঙ্কনশিল্প, হস্তশিল্প ইত্যাদি কাজে শৈল্পিক শ্রমের ব্যবহার হয়ে থাকে।

গ. বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রম: বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রম বলতে ঐ সব পুঁজিহীন শ্রমকে বোঝায়, যেগুলোয় দেহের চেয়ে মস্তিষ্ককে বেশি খাটানো হয়। যেমন পরিচালনা, শিক্ষকতা, ডাক্তারি, আইনজীবী ইত্যাদি।

মালিক-শ্রমিকের মধ্যকার কাঙ্ক্ষিত সম্পর্ক

শ্রম উৎপাদনের একটি অপরিহার্য উপাদান। ভূমি, মূলধন ও সংগঠন ছাড়া যেমন কোন উৎপাদন কাজ চলতে পারে না, তেমনি শ্রমিকের শ্রম ছাড়া উৎপাদন কর্মকাণ্ড কল্পনা করা যায় না। একজন মালিক তার মূলধন বিনিয়োগ করেন এবং একজন শ্রমিক তার মেধা ও শ্রম দিয়ে সেই বিনিয়োগে আত্মনিয়োগ করে পণ্য উৎপাদন করেন। সেই উৎপাদিত পণ্য ভোগ করে সাধারণ মানুষ বেঁচে থাকে। তাই সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে মালিক-শ্রমিক একে অন্যের পরিপূরক। তাদের সম্পর্ক সন্তোষজনক হওয়া বাঞ্ছনীয়।

মালিক-শ্রমিকের সম্পর্ক হবে বন্ধুত্বপূর্ণ। সামাজিক জীব হিসেবে তারা পরস্পর একে অন্যের উপর নির্ভরশীল। মালিক যেমন শ্রমিক ব্যতীত তার মূলধন বিনিয়োগ করতে পারবে না, ঠিক তেমনি শ্রমিক মালিকের মূলধন ব্যতীত তার মেধা ও শ্রমকে কাজে

লাগাতে পারবে না। মালিক স্বীয় মেধা, শ্রম ও সাংগঠনিক যোগ্যতা দিয়ে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান ও উৎপাদন কারখানা স্থাপন করেন। শ্রমিক স্বীয় মেধা, শ্রম ও দক্ষতা দিয়ে সেই ব্যবসায়িক কারখানায় পণ্য উৎপাদন করেন। উৎপাদিত পণ্যের মুনাফা থেকে উভয়ের জীবন-জীবিকা নির্বাহ হয়। তাই মালিক ও শ্রমিক পরস্পর ভাই ভাই ও উৎপাদন কর্মকাণ্ডের একে অন্যের অংশীদার। একজন অন্যজনকে বাদ দিয়ে উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনা করা মোটেও সম্ভব নয়। রাসূল স. শ্রমিককে ভাই হিসেবে ঘোষণা করেছেন। তিনি ইরশাদ করেন:

إِنَّ إِخْوَانَكُمْ خَوَلُكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ، فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، وَلاَ تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَأَعِينُوهُمْ.

তোমাদের ভাইয়েরাই তোমাদের দাসদাসী, তাদেরকে আল্লাহ তাআলা তোমাদের অধীনস্ত করে দিয়েছেন। অতএব, যার ভাই তার অধীনে থাকবে, তাকে তা-ই খাওয়াবে যা সে নিজে খায় এবং তাকে তা-ই পরিধান করাবে যা সে নিজে পরিধান করে। আর তাদের সাধ্যের বাইরে তাদের উপর কোন কাজ চাপিয়ে দিও না। একান্ত যদি তাদের উপর সাধ্যাতীত কোন কাজ চাপিয়ে দাও, তাহলে তা সমাধানে তাদেরকে সাহায্য করো (Al-Bukhārī 1304H, 2545)।

তাই শ্রমিককে ভাই এর মতো মনে করে তার সাথে ভ্রাতৃসুলভ আচরণ করতে হবে। যদি মালিক ও শ্রমিক পরস্পর নিজেদের অধিকারগুলোর প্রতি ন্যায়ানুগ সমাধানে ব্রতী হয় এবং নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণে একে অন্যের প্রতি আন্তরিক হয়, তবেই একটি সুখী ও সমৃদ্ধ সমাজ গড়ে ওঠবে। আর যদি পরস্পর বন্ধুভাবাপন্ন আচরণ না করে এবং একে অন্যের প্রতি বিরোধপূর্ণ মনোভাবী হয়, তাহলে নানামুখী সংকট সৃষ্টি হয়ে উভয়েই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সর্বোপরি সমাজ হবে অস্থির ও কলহপূর্ণ।

শ্রম বিরোধের স্বরূপ

মালিক-শ্রমিকের এ দ্বন্দ্বের ইতিহাস মানব সমাজের ইতিহাসের মতই অতি প্রাচীন। এই দু' শ্রেণির পারস্পরিক সম্পর্ক তেমন সুখের কখনো হয়ে ওঠেনি। শ্রমিক শ্রেণি প্রায় সর্বযুগেই মজলুম ছিল এবং মালিক শ্রেণি ছিল জালিম। মালিকগণ শ্রমিকদেরকে সর্বদা অধিকার বঞ্চিত করে নিষ্পেষিত করেছে। আর শ্রমিকগণ মালিকদের জুলুম-নির্যাতনে বিক্ষুব্ধ হয়ে আন্দোলন-সংগ্রাম করেছে। এ ধারাবাহিকতায় ১৮৮৬ সালের ১ মে শ্রমিকরা তাদের অধিকার আদায়ের জন্য আন্দোলন করেছিল। এই দিনে আমেরিকার শিকাগো শহরের হে মার্কেটে ৮ ঘণ্টার বেশি কাজ না করার দাবিতে তারা সমবেত হয়েছিল। এক পর্যায়ে শ্রমিকরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করলে পুলিশ তাদের উপর

গুলি বর্ষণ করে। এতে কিছুসংখ্যক শ্রমিক নিহত হয়। শ্রমিকদের অধিকার আদায়ের প্রতীক হিসেবে প্রতি বছর মে মাসের ১ তারিখ সারা বিশ্বে মে দিবস পালন করা হয়। (wikipedia 2017) তারপরও তারা স্বীয় অধিকার পাচ্ছে না। অধিকন্তু তারা পদে পদে নিগৃহীত, নির্যাতিত ও নিষ্পেষিত হচ্ছে।

রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর পৃথিবী ব্যাপী শ্রমিকশ্রেণি সংগঠিত হতে শুরু করে এবং দেশে দেশে প্রত্যেক কর্মসংস্থানে তারা সংগঠন প্রতিষ্ঠা করতে শুরু করে মিল-কারখানায় মালিকদের নাকানি চুবানি খাওয়ায়। অন্যদিকে মালিকশ্রেণিও বসে থাকেনি। তারাও বিভিন্ন নামে সংগঠিত হয়। অতঃপর অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, শ্রমিকশ্রেণি স্বীয় দাবি আদায়ের জন্য যেমনি হরতাল পালন করে, ঠিক তেমনি মালিক শ্রেণি এ হরতাল দমন করার জন্য মিল কারখানায় তালা ঝুলিয়ে দেয়। এ কারণে ব্যবসা বাণিজ্য মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। উৎপাদন কমে যায়, বাজারমূল্য উর্ধ্বগতি হয়ে সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাহিরে গিয়ে অবস্থা অত্যন্ত বেগতিক হয়ে যায়। এভাবে দেশ গরীব থেকে গরীব হতে থাকে। মানুষের জীবন হতে থাকে দুর্বিষহ।

এ সম্পর্কে দুনিয়ার মানব কল্যাণকামী অসংখ্য ব্যক্তি মালিক-শ্রমিকের এ দ্বন্দ্বের একটা স্থায়ী সমাধানের জন্য অসংখ্য চেষ্টা তদ্‌বীর করেছেন। কিন্তু ফলপ্রসূ তেমন কোন অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়নি। বরং উভয়ের মাঝে দূরত্বের সে মরু সাহারা এখনো বিদ্যমান। গরীব আজো জুলুমের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত হচ্ছে, মালিক তার জুলুমের হস্ত সম্প্রসারিত করেই চলেছে। এ ব্যাপারে জাতিসংঘের অধীনে একটি সংগঠন (International Labour Organization) নামে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এ সংগঠন কর্তৃক প্রণীত শ্রম আইন পৃথিবীর সব দেশেই প্রচলিত রয়েছে। তাছাড়া প্রত্যেক দেশে বিভিন্ন নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। কিন্তু এত কিছুর পরও মালিক-শ্রমিকের দ্বন্দ্বের অবসান হয়নি।

বাংলাদেশে মালিক-শ্রমিক সম্পর্কের সামগ্রিক চিত্র

বাংলাদেশে মালিক-শ্রমিকের মধ্যকার সম্পর্ক মনিব-ভৃত্যের ন্যায়। শিল্প বিপ্লবের ফলে সারা বিশ্বের ন্যায় বাংলাদেশেও সব উপায়-উপকরণ পুঁজিপতি মালিকশ্রেণির হাতে কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়েছে। মালিকশ্রেণি মজদুর জনতার অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে তাদের নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হয়েছে এবং শ্রমিকশ্রেণিকে নিজেদের আজ্ঞাবহ মনে করতে শুরু করেছে। ফলে মধ্যযুগের ন্যায় মুক্ত সভ্যতার যুগেও অঘোষিতভাবে শ্রমিকশ্রেণি এক ধরনের নিষ্পেষনের জিঞ্জিরে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। মধ্যযুগের শ্রমিকদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার তুলনায় আজকের আধুনিক শ্রমিকশ্রেণির আবস্থার কোন পার্থক্য নেই। আগে শোষণ চলত বর্বর কায়দায় আর এখন চলে আধুনিক কায়দায়।

শ্রমিক-মজুরদের ৬০ থেকে ৭০ শতাংশ তৈরি পোশাক শিল্প কারখানাগুলোতে নিয়োজিত রয়েছে। বাকি ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ শ্রমিক ঔষধ শিল্প, চামড়া শিল্প, লৌহ শিল্প, সিরামিক শিল্প, নির্মাণ শিল্প, মৎস খামার, চা বাগান, চিংড়ি ঘের, ইটভাটা প্রভৃতি শিল্প কারখানায় কর্মরত রয়েছে। তারা পদে পদে শোষণ ও বঞ্চনার শিকার হচ্ছে। মালিকদের বিরুদ্ধে প্রায়শই শ্রমিকদের সাথে গৃহ ভৃত্যের মত যথেচ্ছা ব্যবহার, ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিতকরণ, নারী শ্রমিকদের যৌন হয়রানিকরণসহ নানা অভিযোগ ওঠতে দেখা যায়। শ্রমিকরা অধিকার আদায়ের জন্য শ্রম ধর্মঘট, কর্ম বিরতি ও হরতালসহ নানাবিধ আন্দোলন করতে বাধ্য হয়। ফলে অনেকাংশে মালিক-শ্রমিকের মাঝে বিবদমান দুটো পক্ষের ন্যায় শত্রুতামূলক সম্পর্ক বিরাজমান থাকে।

তাছাড়া বিপুল সংখ্যক শ্রমিক রয়েছে, যাদের শ্রমিকের স্বীকৃতিটুকু এখনো মেলেনি। এদের অধিকার আদায়ের প্রশ্ন তো বহু দূরের কথা। এদের মধ্যে কৃষি খাতের মজদুর ও গৃহস্থালির কর্মী অন্যতম। এদের জীবন এখনো মানবেতর অবস্থায় পড়ে আছে। এদের কর্ম ঘণ্টা যেমন অনেকাংশে নির্ধারিত নেই, তেমনি বেতন-বোনাসেরও সুনির্দিষ্ট নীতিমালা নেই। বিশেষত গৃহকর্মীরা দিবা-রাত্রির অধিকাংশ সময় বিরতিহীনভাবে গৃহস্থালির বিভিন্ন কর্মে নিয়োজিত থাকে। কিন্তু পরিণামে এরা খাবার-দাবার, ভরণ-পোষণ ও বিশ্রামসহ সর্বক্ষেত্রে চরম উপেক্ষিত থাকে। এদের কোন অধিকার আছে বলে মনে করা হয় না।

সর্বোপরি বাংলাদেশে শ্রমিকদের ন্যায্য পাওনাটুকু প্রাপ্তির নিশ্চিত পরিবেশ এখনো গড়ে ওঠেনি। ন্যায্য মজুরির জন্যই শ্রমিকদের নিয়মিত আন্দোলন-সংগ্রাম করতে হয়। চিকিৎসা, শিক্ষা ও বাসস্থানের মত মৌলিক অধিকারগুলো প্রাপ্তির তো কোন প্রশ্নই আসে না। তাদের হাড়ভাঙ্গা খাটুনির মুনাফায় মালিকশ্রেণি বিলাসী জীবন যাপন করছে। কিন্তু শ্রমিকশ্রেণি প্রায় সবদিক থেকে উপেক্ষিত হয়ে মানবেতর জীবন যাপন করছে।

মালিক-শ্রমিক দ্বন্দ্বের কারণসমূহ

১. **ন্যায্য মজুরিঃ** মালিক-শ্রমিক দ্বন্দ্বের অন্যতম কারণ হচ্ছে ন্যায্য মজুরি থেকে শ্রমিকদেরকে বঞ্চিত করা। শ্রমিকদের হাড়ভাঙ্গা শ্রমে অর্জিত মুনাফা একচ্ছত্রভাবে মালিকরা ভোগ করে থাকে। শ্রমিকরা মুনাফার অংশের ভাগীদার হওয়া তো দূরের কথা; অনেক ক্ষেত্রে ন্যায্য মজুরিটাই তাদের আন্দোলন ও সংগ্রাম করে আদায় করতে হয়। ন্যূনতম মজুরি যা অনেক দেন-দরবারের পর নির্ধারিত হয়, তা-ই অনেক কারখানার মালিক সময়মত দিতে চায় না। অনেক মালিক শ্রমিকদের কষ্টার্জিত মুনাফা দিয়ে নানাভাবে বিলাসিতায় মত্ত থাকে। অথচ বিভিন্ন টালবাহানা করে মাসের পর মাস শ্রমিকদের বেতন বকেয়া রেখে দেয়। ফলে দেখা যায়, ন্যায্য মজুরি আদায়ের চেয়ে ন্যূনতম মজুরির বকেয়া পাওনা আদায় করতেই তাদের আন্দোলন করতে হয়।

২. **চাকুরীর নিশ্চয়তাঃ** অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠানে এখনো শ্রমিকদের চাকুরীর নিশ্চয়তা (Job Security) নেই। কতিপয় প্রতিষ্ঠানে এ সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত বিধি-বিধান থাকলেও তা সম্পূর্ণভাবে মানা হয় না। আবার অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানে এ সংক্রান্ত কোন নীতিমালাই নেই। মালিকেরা নিজেদের ইচ্ছামত প্রয়োজন অনুযায়ী শ্রমিক নিয়োগ করে। আবার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে কোন ধরনের কারণ দর্শানো ছাড়াই শ্রমিক ছাটাই করে। যার ফলশ্রুতিতে শ্রমিকেরা সব সময় আতংক ও উৎকণ্ঠার মধ্যে জীবনযাপন করে।

৩. **মালিকদের আচরণঃ** মালিক ও শ্রমিকের মাঝে অসন্তোষ সৃষ্টির জন্য মালিকদের আচরণও অনেকাংশে দায়ী। মালিকেরা শ্রমিকদের সাথে ভৃত্যের ন্যায় আচরণ করে। সামান্য বিষয় নিয়ে হরহামেশা বকাঝকা ও দুর্ব্যবহার করে। এমনকি অনেক সময় গায়ে হাত তুলতেও দেখা যায়। ফলে ভাল বেতন পাওয়া সত্ত্বেও শ্রমিকেরা এক ধরনের মনোকষ্টে ভুগে। এক পর্যায়ে দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের রূপ ধারণ করে।

৪. **অনুন্নত কর্ম পরিবেশঃ** বাংলাদেশের অধিকাংশ কল-কারখানার পরিবেশ অত্যন্ত নিম্ন মানের। ঝুঁকিপূর্ণ পুরানো ভবনে বা গিজগিজে টিনশেডের সংকীর্ণ পরিসরে অনেক কারখানার উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালিত হয়। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পেটের দায়ে শ্রমিকরা আবদ্ধ ও স্যাঁত স্যাঁতে পরিবেশে কাজ করতে বাধ্য হয়। অনেক কারখানায় দুর্ঘটনা রোধের পর্যাপ্ত সরঞ্জামের ন্যূনতম ব্যবস্থাও নেই। তাই প্রায়শ দেখা যায়, কল-কারখানাগুলোতে বিভিন্ন দুর্ঘটনায় শত শত শ্রমিক মারা যাচ্ছে, নতুবা পঙ্গু বা বিকলাঙ্গ হয়ে করুণভাবে দিনাতিপাত করছে।

৫. **অতিরিক্ত কাজের চাপঃ** অতি মুনাফালোভী অনেক কারখানা মালিক নামকাওয়াস্তে কর্মঘণ্টা নির্ধারণ করলেও তা অনুসরণ করে না। শ্রমিকদেরকে নির্দিষ্ট কর্মঘণ্টার পরেও কাজ করতে বাধ্য করে। এই অতিরিক্ত কর্মঘণ্টার জন্য সামান্য পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা থাকলেও তা পুরোপুরি আদায়ে অনেকে গড়িমসি করে। শ্রমিকরা অনেকাংশে চাকুরী হারানোর ভয়ে অতিরিক্ত কাজ করতে বাধ্য হয়।

৬. **অন্যায়ভাবে বরখাস্তকরণঃ** কল-কারখানা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোতে, বিশেষত গার্মেন্ট কারখানাগুলোতে শ্রমিক ছাঁটাই মামুলি ঘটনা। সামান্য অজুহাতে পূর্ব নোটিশ ব্যতিরেকে কর্মী ছাঁটাই করা হয়। অনেক সময় দেখা যায়, কোন ধরনের অজুহাত ছাড়াই প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের অনেক পুরানো শ্রমিকদেরকেও ছাঁটাই করে দেয়। ছাঁটাই বা বরখাস্তের পর তাদেরকে কোন ধরনের সুবিধা প্রদান করা হয় না। ফলে তারা স্বীয় অধিকার আদায়ে আন্দোলনে নামতে বাধ্য হয়।

৭. **ঝুট ব্যবসাঃ** গার্মেন্ট কারখানাগুলোতে ঝুঁট ব্যবসাকে কেন্দ্র করে দ্বন্দ্ব-সংঘাত সৃষ্টি হয়। এ ব্যবসাকে ঘিরে সংশ্লিষ্ট এলাকায় বিভিন্ন সন্ত্রাসী বাহিনী গড়ে ওঠে। প্রভাবশালী ব্যক্তিরা ব্যবসার নিয়ন্ত্রণ লাভের জন্য এ সব বাহিনীকে ব্যবহার করে

থাকে। কোন কোন ব্যক্তি ব্যবসার নিয়ন্ত্রণ লাভে ব্যর্থ হয়ে এ বাহিনীর মাধ্যমে অরাজকতা সৃষ্টি করে। কখনো ব্যবসার প্রভাব বিস্তার, ব্যবসার সম্প্রসারণ ও নিয়ন্ত্রণ এবং একজনের ব্যবসা অন্যজন ভাগিয়ে নেয়ার প্রচেষ্টায় এরা কোন কারখানার শ্রমিকদের নানা কায়দায় উসকে দিয়ে থাকে। শ্রমিকরা এদের ইন্ধনে বিভিন্ন ইস্যুতে মালিকের উপর ক্ষুব্ধ হয়ে আন্দোলন করে।

৮. **টিফিন ব্যবসা:** বিভিন্ন কারখানা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকদের টিফিন দেয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। এ টিফিন সরবরাহ করার জন্য শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিকগণ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে টেন্ডারের মাধ্যমে দায়িত্ব দিয়ে থাকেন। টেন্ডারের মাধ্যমে এ টিফিন সরবরাহকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন গ্রুপ প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয় এবং এর নিয়ন্ত্রণ লাভের জন্য সন্ত্রাসী বাহিনীর আশ্রয় নেয়। এরা নানাভাবে শ্রমিকদেরকে উসকে দিয়ে মালিক ও শ্রমিকের মাঝে দ্বন্দ্ব-সংঘাত সৃষ্টির পাঁয়তারা করে (*Bangladesh Protidin,* Jan. 1, 2015)।

শিল্প বিরোধ নিষ্পত্তি

শিল্প বিরোধ নিষ্পত্তির উদ্যোগকে তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়:

ক. পারস্পরিক মীমাংসার্থে আলাপ-আলোচনা (Negotiation)

যদি কোন সময়ে কোন মালিক বা শ্রমিক প্রতিনিধি দেখতে পায় যে, মালিক ও শ্রমিকগণের মধ্যে কোন বিরোধ হওয়ার সম্ভাবনা আছে, তাহলে উক্ত মালিক বা শ্রমিক প্রতিনিধি তার অভিমত অন্যপক্ষকে লিখিতভাবে জানাবেন। পত্রপ্রাপ্তপক্ষ অপরপক্ষের সাথে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে উত্থিত বিরোধ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে একটি চুক্তিতে উপনীত হওয়ার জন্য একটি সভার ব্যবস্থা করবেন। যদি আলোচনার পর পক্ষগণ কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন, তাহলে উক্ত সিদ্ধান্ত লিখিতভাবে সম্পাদন করে উভয়পক্ষ স্বাক্ষর করবেন। অতঃপর লিখিত একটি কপি মালিকপক্ষ সরকার, শ্রম পরিচালক এবং সালিসের নিকট প্রেরণ করবেন। বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর ২১০ নং ধারায় বলা হয়েছে:

> যদি কোন সময়ে কোন মালিক বা যৌথ দর কষাকষি প্রতিনিধি দেখতে পায় যে, মালিক এবং শ্রমিকগণের মধ্যে কোন বিরোধ উত্থিত হবার সম্ভাবনা আছে, তাহলে উক্ত মালিক অথবা যৌথ দর কষাকষি প্রতিনিধি তার বা এর অভিমত অন্য পক্ষকে লিখিতভাবে জানাবেন।
>
> পত্র প্রাপ্তির পনের দিনের মধ্যে পত্রপ্রাপক, অন্যপক্ষের সাথে আলোচনাক্রমে, পত্রে উত্থাপিত বিষয়ে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে একটি চুক্তিতে উপনীত হওয়ার লক্ষ্যে যৌথ দরকষাকষি শুরু করবার জন্য তার সাথে একটি সভার ব্যবস্থা করবেন, এবং এরূপ সভা এতদউদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত উভয় পক্ষের প্রতিনিধির মধ্যেও অনুষ্ঠিত হতে পারবে।

> যদি পক্ষগণ উক্তরূপ আলোচনার পর আলোচিত বিষয়ের উপর কোন নিষ্পত্তিতে উপনীত হন, তাহলে একটি নিষ্পত্তিনামা লিখিত হবে এবং এতে পক্ষদ্বয় দস্তখত করবেন, এবং এর একটি কপি মালিক কর্তৃক সরকার, শ্রম পরিচালক এবং সালিসের নিকট প্রেরিত হবে (*The Bangladesh Labour Code* 2006, sec 210/1, 2 & 3)।

খ. সালিসী কার্যক্রম (Conciliation)

যদি পত্রপ্রাপক পনের দিনের মধ্যে সভার ব্যবস্থা করতে ব্যর্থ হয় অথবা পক্ষদ্বয় সভার তারিখ থেকে এক মাসের মধ্যে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে না পারে, তাহলে যে কোন পক্ষ উক্ত সময়সীমা শেষ হওয়ার পনের দিনের মধ্যে সালিসের নিকট আবেদন করতে পারবেন। সরকার সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপনের মধ্যমে নির্দিষ্ট শিল্প এলাকার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক সালিস নিযুক্ত করবেন। সালিস আবেদনের ১০ দিনের মধ্যে উক্ত বিরোধ নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ করবেন এবং একটি সভা আহ্বান করবেন। যদি পক্ষদ্বয় কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন, তাহলে লিখিত আকারে উভয়ের স্বাক্ষরসহ সিদ্ধান্তের একটি কপি ও একটি রির্পোট সরকারের কাছে জমা দিবেন। যদি সালিস আবেদন প্রাপ্তির ৩০ দিনের মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তি করতে ব্যর্থ হন, তাহলে সালিসী কাযক্রম ব্যর্থ বলে ধরে নেয়া হবে। বাংলাদেম শ্রম আইন, ২০০৬ এর ২১০ নং ধারায় বলা হয়েছে,

> "যদি
>
> (ক) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রেরিত কোন পত্রের প্রাপক অন্য পক্ষের সাথে উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত সময়ের মধ্যে সভার ব্যবস্থা করতে ব্যর্থ হন, তাহলে উক্ত অন্য পক্ষ, অথবা
>
> (খ) উভয় পক্ষই পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য অনুষ্ঠিত প্রথম সভার তারিখ হতে এক মাসের মধ্যে অথবা উভয় পক্ষের লিখিত সম্মতি অনুযায়ী বর্ধিত সময়ের মধ্যে কোন নিষ্পত্তিতে উপনীত হওয়া না যায়, তাহলে যে কোন পক্ষ, উপ-ধারা (২) অথবা, ক্ষেত্রমতে, এই উপ-ধারার দফা (খ) এ উল্লিখিত সময়সীমা শেষ হবার পর পনের দিনের মধ্যে তৎসর্ম্পকে উপ-ধারা (৫) এ উল্লিখিত উপযুক্ত সালিসকে (Conciliation) অবহিত করতে পারবেন এবং বিরোধটি সালিসীর (Conciliation) মাধ্যমে নিষ্পত্তি করার জন্য তাকে লিখিতভাবে অনুরোধ করতে পারবেন।
>
> (৫) এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্যে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এতে উল্লিখিত কোন নির্দিষ্ট এলাকা অথবা কোন নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক সালিস (Conciliation) নিযুক্ত

করবে, এবং উপ-ধারা (৪) এর অধীন সালিসীর (Conciliation) জন্য কোন অনুরোধ এই উপ-ধারার অধীন সংশ্লিষ্ট এলাকা বা প্রতিষ্ঠান বা শিল্পের জন্য নিযুক্ত সালিস (Conciliation) গ্রহণ করবেন।

(৬) উক্তরূপ অনুরোধ প্রাপ্ত হবার দশ দিনের মধ্যে সালিস (Conciliator) তাহার সালিসী কার্যক্রম (Conciliation) শুরু করবেন, এবং বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য উভয় পক্ষের সভা আহ্বান করবেন।

(৭) বিরোধের পক্ষগণ স্বয়ং অথবা তাদের মনোনীত এবং উভয় পক্ষের মধ্যে অবশ্য পালনীয় চুক্তি সম্পাদন করতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে সালিস (Conciliator) এর নিকট তৎকর্তৃক নির্ধারিত তারিখে ও সময়ে হাজির হবেন।

(৮) যদি সালিসীর (Conciliation) ফলে বিরোধ নিষ্পত্তি হয়, তাহলে সালিস (Conciliator) তৎসম্পর্কে সরকারের নিকট একটি রিপোর্ট পেশ করবেন এবং এর সাথে উভয়পক্ষ কর্তৃক স্বাক্ষরিত নিষ্পত্তিনামার একটি কপিও প্রেরিত হবে।

(৯) যদি সালিস (Conciliator) কর্তৃক বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য অনুরোধ প্রাপ্তির ত্রিশ দিনের মধ্যে বিরোধটি নিষ্পত্তি না হয়, তাহলে সালিসী কার্যক্রম (Conciliation) ব্যর্থ হবে, অথবা উভয় পক্ষের লিখিত সম্মতিক্রমে আরো অধিক সময় চালানো যাবে (*The Bangladesh Labour Code* 2006, sec 210/4-A & B, 5, 6, 7, 8 & 9)।"

গ. মধ্যস্থতা কার্যক্রম (Arbitration)

যদি পক্ষদ্বয় বিরোধটি মধ্যস্থতাকারী কর্তৃক নিষ্পত্তির জন্য রাজী হয়, তবে তাদের যৌথ আবেদনের প্রেক্ষিতে সরকার কর্তৃক প্রস্তুতকৃত তালিকা হতে একজন অথবা পক্ষদ্বয়ের পছন্দকৃত একজন ব্যক্তিকে মধ্যস্থতাকারী নিয়োগ করা হবে। মধ্যস্থতাকারী আবেদনের ৩০ দিনের মধ্যে তার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করবেন। তিনি সিদ্ধান্তের একটি কপি সরকার এবং আরেকটি কপি পক্ষদ্বয়ের নিকট প্রেরণ করবেন। মধ্যস্থতাকারীর এ সিদ্ধান্ত ২ বৎসর বলবৎ থাকবে। এর বিরুদ্ধে কোন ধরনের আপিল চলবে না। বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর ২১০ নং ধারায় বলা হয়েছে,

"(১২) যদি পক্ষগণ বিরোধটি নিষ্পত্তির জন্য কোন মধ্যস্থতাকারীর (Arbitrator) নিকট প্রেরণ করতে রাজী হন, তাহলে তাহাদের সকলের স্বীকৃত কোন মধ্যস্থতাকারীর (Arbitrator) নিকট বিরোধটি নিষ্পত্তির জন্য যৌথ অনুরোধপত্র প্রেরণ করবেন।

(১৩) উপ-ধারা (১২) তে উল্লিখিত মধ্যস্থতাকারী (Arbitrator) সরকার কর্তৃক এতদ্‌উদ্দেশ্যে প্রস্তুতকৃত মধ্যস্থতাকারীর তালিকা হতে কোন ব্যক্তি হতে পারবেন, অথবা পক্ষগণ কর্তৃক অন্য যে কোন ব্যক্তি হতে পারবেন।

(১৪) মধ্যস্থতাকারী (Arbitrator) মধ্যস্থতার অনুরোধ প্রাপ্তির ত্রিশ দিনের মধ্যে, অথবা পক্ষগণ কর্তৃক লিখিতভাবে স্বীকৃত কোন বর্ধিত সময়ের মধ্যে তার রোয়েদাদ প্রদান করবেন।

(১৫) মধ্যস্থতাকারী (Arbitrator) তার রোয়েদাদ প্রদানের পর এর একটি কপি পক্ষগণের এবং আরেকটি কপি সরকারের নিকট প্রেরণ করবেন।

(১৬) মধ্যস্থতাকারী (Arbitrator) কর্তৃক প্রদত্ত রোয়েদাদ চূড়ান্ত হবে এবং এর বিরুদ্ধে কোন আপীল চলবে না (*The Bangladesh Labour Code* 2006, sec 210/12, 13, 14, 15 & 16)।"

ইসলামী বিধানে মালিক-শ্রমিক দ্বন্দ্ব নিরসন

ইসলাম বহুকাল পূর্বেই মানব সমাজে মালিক-শ্রমিকের মধ্যকার বৈরিতার অবসান ঘটিয়ে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠার চমৎকার নীতিমালা ঘোষণা করেছে। আজকের শ্রমজীবী মানুষের অবস্থা ইসলাম পূর্বযুগের শ্রমজীবী মানুষের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কেননা জাহিলী সমাজে খেটে খাওয়া মানুষের অধিকার ছিল চরমভাবে উপেক্ষিত। শ্রমজীবী মানুষ পণ্যদ্রব্যের মতো হাট-বাজারে বেচাকেনা হতো। অনেকেরই পায়ে পরিয়ে দেয়া হতো চির দাসত্বের শিকল। এমনকি শ্রমিকদের কথা বলার মতোও কোন অধিকার ছিল না। এমতাবস্থায় মহানবী স. পুঁজি এবং শ্রমের মধ্যে এমন ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং মালিক-শ্রমিকের মধ্যে এমন ভ্রাতৃত্বপূর্ণ বন্ধন স্থাপন করেছেন, যা কিয়ামত পর্যন্ত মানুষের জন্য উত্তম আদর্শের বার্তা বহন করবে।

নবী করীম স. মালিক-শ্রমিককে আপসে ভাই ভাই হিসেবে অভিহিত করেছেন। বাস্তবে একে অপরের সাহায্যকারী অর্থনৈতিক উন্নতির দুটি চাকা। এ সম্পর্কে নবী স.-এর প্রদত্ত নির্দেশনা অত্যন্ত স্পষ্ট, যাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। কিন্তু আফসোসের বিষয় যে, ইসলামের মহান শিক্ষাকে উপেক্ষা করে বর্তমান পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শ্রমিকদের গোলাম বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। আবার প্রচলিত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শ্রমিকদের জীবনকে যেন মেশিন বানিয়ে দেয়া হয়েছে। যদিও সমাজতান্ত্রিক শ্লোগানে শ্রমিকদেরকে মালিকদের গোলামীর জিঞ্জির থেকে মুক্তি দেওয়ার লোভনীয় বুলি ছিল। তারা এ ক্ষেত্রে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। তারা শ্রমিকশ্রেণিকে ব্যক্তির গোলামীর জিঞ্জির থেকে মুক্ত করে সরকারি গোলামীর শৃংখলাবদ্ধ করে দিয়েছে। যার দ্বারা তারা আরো নিষ্পেষিত হওয়ার দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছে। কিন্তু মানবতার দিশারী আমাদের প্রিয় নবী স. মজদুরশ্রেণীকে মানবিকভাবে সমতার কাতারে এনে নজীরবিহীন এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

ইসলাম মালিক-শ্রমিকের সম্পর্ক উন্নয়নের ক্ষেত্রে যে নীতিমালা উপহার দিয়েছে, তা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুসরণ করলে মালিক-শ্রমিকের মাঝে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হওয়ার কোন অবকাশই থাকবে না। ইসলাম মালিক-শ্রমিকের সম্পর্কে ভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রে প্রদত্ত নীতিমালায় শ্রমিকের প্রতি মালিকের কতগুলো দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা বলেছে, তদ্রূপ মালিকের প্রতিও শ্রমিকের কতিপয় দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারণ করে দিয়েছে। উভয়ই আপন দায়িত্ব ও কর্তব্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হলে কোন বিবাদ সৃষ্টি হওয়ার সুযোগ থাকবে না। তাই নিম্নে উভয়ের দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলো আলাদাভাবে বিশ্লেষণ করা হবে।

মালিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য

মালিক পুঁজি, মেধা ও যোগ্যতার যোগান দিয়ে থাকেন। তিনি স্বীয় মূলধন বিনিয়োগ করে শিল্প প্রতিষ্ঠান বা কল-কারখানা প্রতিষ্ঠা করেন। মালিকের শিল্প প্রতিষ্ঠানে মূলধনহীন শ্রমিক স্বীয় শ্রম ও মেধার সর্বস্ব বিলীন করে উৎপাদনের যোগান দেয়। তাই মালিকের উচিত হলো, শ্রমিকের অধিকারগুলো পুরোপুরি নিশ্চিত করা। শ্রমিকের প্রতি মালিকের দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলো নিম্নে আলোকপাত করা হলো:

১. সময়মত মজুরি প্রদান করা

মালিকের প্রধান দায়িত্ব হলো শ্রমিকের পাওনা যথা সময়ে পরিশোধ করা। শ্রমিক মাথার ঘাম ঝরিয়ে মালিক থেকে বেতনের হকদার হয়। কষ্টার্জিত এ হকটি সঠিক সময় পাওয়ার জন্য শ্রমিকেরা মালিকদের প্রতি বিভিন্ন অভিযোগ-অনুযোগ পেশ করে। তাদের এ অভিযোগ বহুলাংশে সঠিক প্রতীয়মান হয়। যার কারণে অনেক সমস্যার সৃষ্টি হয়। বর্তমান সমাজে মালিক-শ্রমিকের মধ্যে দ্বন্দ্বের মূল কারণ হচ্ছে সময়মত মজুরি পরিশোধ না করা। হাদীসে যথা সময়ে মজুরি পরিশোধ করার প্রতি জোর তাগিদ প্রদান করা হয়েছে। মহানবী স. ইরশাদ করেন,

أَعْطُوا الأَجِيرَ أَجْرَهُ، قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ.

তোমরা মজুরের শরীরের ঘাম শুকাবার আগে-ই তার মজুরি দিয়ে দিবে (Ibn Mājah, D. N., 2443)।

মজুরি নিয়ে কোন ধরনের টালবাহানা করা যাবে না। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ স. বলেন:

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ.

ধনী ব্যক্তির (পক্ষ থেকে কারো পাওনা প্রদানে) টালবাহানা করা জুলুম; আর যখন তোমাদের কাউকে কোন সচ্ছল ব্যক্তির প্রতি ন্যস্ত করা হয়, তখন সে যেন তার অনুসরণ করে (Al-Bukhārī 1304H, 2287)।

এ হাদীস দ্বারা সাধারণভাবে ঋণ পরিশোধ সংক্রান্ত বিষয়কে উদ্দেশ্য করা হয়। কিন্তু বেতন পরিশোধ করা তো ঋণ পরিশোধের চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

মহানবী স. এমনও বলেছেন যে, যদি কোন কারণে অর্থাৎ মনোমালিন্যের কারণে মজদুর তার পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে না পারে এবং তার এ অর্থ যদি মালিক কোন ব্যবসায়িক কাজে ব্যবহার করে, পরবর্তীতে মজদুরের চাহিবামাত্র তার অর্থের লভ্যাংশসহ তাকে ফিরিয়ে দিতে হবে। এ সম্পর্কে ইমাম বুখারী র. তাঁর জামি' গ্রন্থে কিতাবুল ইজারা নামে নির্দিষ্ট একটি অধ্যায় রচনা করেছেন। সেখানে একটি পরিচ্ছেদ রয়েছে, যার শিরোনাম হচ্ছে:

مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَتَرَكَ الأَجِيرُ أَجْرَهُ، فَعَمِلَ فِيهِ الْمُسْتَأْجِرُ فَزَادَ، أَوْ مَنْ عَمِلَ فِي مَالِ غَيْرِهِ، فَاسْتَفْضَلَ.

কেউ যদি কোন ব্যক্তিকে পারিশ্রমিকের উপর কাজে লাগায়, অতঃপর যদি মজদুর তার পারিশ্রমিক ছেড়ে যায় কোন কারণে, এরপর মালিক যদি মজদুরের অর্থ কোন ব্যবসায়িক কাজে লাগায় এবং তা বৃদ্ধি পায়, তবে ফিরিয়ে দেয়ার সময় বৃদ্ধি হওয়া অর্থসহ ফিরিয়ে দিতে হবে (Al-Bukhārī 1304H, 3/ 91)।

২. বেতন নির্দিষ্টকরণ

বেতন নির্দিষ্ট করে নেয়া মালিকের কর্তব্য। কাজ শুরু করার পূর্বেই পারিশ্রমিক নির্ধারণ করে নিতে হবে। এ সম্পর্কে নবী করীম স. ইরশাদ করেছেন:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " نَهَى عَنِ اسْتِئْجَارِ الأَجِيرِ، يَعْنِي حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُ أَجْرَهُ.

মজুরের মজুরি স্পষ্টভাষায় নির্ধারণ না করে তাকে কাজে নিযুক্ত করতে নবী করীম স. নিষেধ করেছেন (Al-Baihaqī 2003, 11652)।

অন্য এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেছেন:

مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعْلِمْهُ أُجْرَتَهُ.

কোন ব্যক্তি যদি পারিশ্রমিকের উপর কোন ব্যক্তিকে কাজে লাগায়, তবে তার পারিশ্রমিক (পূর্বেই) বলে দিতে হবে (Ibn Qudāma 1968, 4161)।

তবে মজুরি যা ইচ্ছা তাই নির্দিষ্ট করে নিলে চলবে না। বরং ন্যূনতম মজুরি প্রত্যেক শ্রমিকের প্রয়োজনানুসারে নির্ধারিত হতে হবে। অর্থাৎ প্রত্যেক শ্রমিককে কমপক্ষে এমন মজুরি দিতে হবে, যেন সে এর দ্বারা ন্যায়ানুগ ও স্বাভাবিক চাহিদা মিটাতে পারে (IFA, 2013, 498)। এ ব্যাপারে মহানবী স. ইরশাদ করেন:

إِنَّ إِخْوَانَكُمْ خَوَلُكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ، فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، وَلاَ تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَأَعِينُوهُمْ.

তোমাদের ভাইয়েরাই তোমাদের দাসদাসী, তাদেরকে আল্লাহ তাআলা তোমাদের অধীনস্ত করে দিয়েছেন। অতএব, যার ভাই তার অধীনে থাকবে, তাকে তা-ই খাওয়াবে যা সে নিজে খায় এবং তাকে তা-ই পরিধান করাবে যা সে নিজে পরিধান করে। আর তাদের সাধ্যের বাইরে তাদের উপর কোন কাজ চাপিয়ে দিও না। একান্ত যদি তাদের উপর সাধ্যাতীত কোন কাজ চাপিয়ে দাও তাহলে তা সমাধানে তাদেরকে সাহায্য করো (Al-Bukhārī, 1304H, 2545)।

এ হাদীসের আলোকে ইসলামী চিন্তাবিদগণ ইনসাফপূর্ণ বেতনের এই সংজ্ঞা দিয়েছেন যে, বেতনের পরিমাণ এমন হবে, যাতে করে মালিক ও মজদুরের জীবন যাপনে মৌলিক প্রয়োজনের ক্ষেত্রে সমতা এনে দেয় (Gilanī, 1926, 457)। মানবতার মূর্তপ্রতীক মহানবী স. ইনসাফপূর্ণ বেতনের শিক্ষা দিয়ে পুঁজিবাদী অর্থনীতির মূলে কুঠারাঘাত করেছেন। যার দ্বারা একজন পুঁজিপতি গরীব-অসহায় শ্রমিকের অসহায়ত্বের সুযোগে বাজার দর শ্রমের ২৫ টাকার স্থলে ৫ টাকায় কাজ করতে তাকে বাধ্য করতে পারবে না।

আধুনিক যুগে পুঁজিপতিরা বেতন কম দেয়ার বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করে গরীব শ্রমিকদের নানাভাবে বঞ্চিত করে চলেছে। মানবতার মহান দরদী রাসূলুল্লাহ স. গরীব শ্রমিকের প্রতি জুলুম সম্পর্কে হুঁশিয়ার করে বলেছেন:

قَالَ اللَّهُ: ثَلاَثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ.

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, কিয়ামতের দিন তিন ব্যক্তির সাথে আমার বিবাদ হবে (১) ঐ ব্যক্তি, যে আমার নামে কোন চুক্তি করে তা ভঙ্গ করেছে (২) সেই ব্যক্তি, যে কোন মুক্ত মানুষকে বিক্রি করে তার মূল্য ভক্ষণ করেছে, এবং (৩) ঐ ব্যক্তি, যে মজুরের দ্বারা কাজ পুরোপুরি করিয়ে নিয়েছে, কিন্তু তার পারিশ্রমিক দেয়নি (Al-Bukhārī, 1304H, 2227)।

৩. কাজের সময় নির্ধারণ

কাজের সময় নির্ধারণ করে নিতে হবে। ইসলাম কাজের কোন নির্ধারিত সময় ঠিক করে দেয়নি। বরং এ ক্ষেত্রে ইসলাম একটি ন্যায়ভিত্তিক নীতিমালা দিয়েছে। ইসলামের দৃষ্টিতে একজন শ্রমিকের কাছ থেকে ততক্ষণই কাজ নেয়া যেতে পারে, যতক্ষণ সে স্বাভাবিকভাবে তা কুলিয়ে উঠতে পারে (Masūd, 1982, 130)। এ ব্যাপারে নবী স. ইরশাদ করেন:

وَلاَ تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَأَعِينُوهُمْ.

আর তাদের সাধ্যের বাইরে তাদের উপর কোন কাজ চাপিয়ে দিও না। একান্ত যদি তাদের উপর কোন কাজ চাপিয়ে দাও তাহলে তা সমাধানে তাদেরকে সাহায্য করো (Al-Bukhārī, 1304H, 2545)।

অন্য এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ স. বলেন:

اكْلَفُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ.

কাজ করার সময় এতটা পরিশ্রম কর, যতটা তোমার সাধ্যে কুলায় (Ibn Mājah, D.N., 4240)।

সুতরাং শ্রমিকের উপর তার সাধ্যাতীত কোন কাজ চাপিয়ে দেয়া ইসলামের দৃষ্টিতে বৈধ নয়। এমনিভাবে মালিক-শ্রমিকের সম্মতিক্রমে সময় সীমা নির্ধারিত হওয়ার পর তার থেকে অধিক সময় কাজ নেয়াটাও শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে জুলুম। কিন্তু শ্রমিক যদি স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে সন্তুষ্টচিত্তে বেশি কাজ করে দেয়, তবে সেটা জুলুমের অন্তর্ভুক্ত হবে না। প্রখ্যাত মনীষী ইবন হাযম রা. বলেন, "মালিকের জন্য উচিত শ্রমিকের কাছ থেকে এতটুকু কাজ নেয়া, যতটুকু সে অনায়াসে সুষ্ঠুভাবে করতে পারে, তার সামর্থ্যে কুলায়। এমন কিছু তার দ্বারা করাতে পারবে না; যার ফলে তার স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হয় (IFA, 2013, 501)।"

৪. কাজের প্রকৃতি নির্ধারণ

কাজের প্রকৃতি বা ধরন পূর্বেই নির্ধারণ করে নিতে হবে। অর্থাৎ শ্রমগ্রহীতা শ্রমিককে দিয়ে কি ধরনের কাজ করাতে চায় তা আগেই নির্দিষ্ট করে নিতে হবে। শ্রমিকের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর বা তাকে অক্ষম বানানোর মত কাজে নিয়োজিত করা ইসলাম সমর্থন করে না। নবী মূসা আ. কে স্বীয় কাজের ধরন বুঝিয়ে দিতে শু'য়াইব আ. এর উক্তি থেকে এর প্রমাণ পাওয়া হয়। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴾

আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাই না। তুমি ইনশাআল্লাহ আমাকে সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত পাবে (Al-Qura'n: 28: 27)।

এ সম্পর্কে ইসলামী আইনগ্রন্থ 'হিদায়ায়' বলা হয়েছে, মালিক শ্রমিক থেকে কী ধরনের কাজ নিতে চায় তাও পূর্বে আলোচনা করে নেয়া মালিকের কর্তব্য। কোন শ্রমিককে এক কাজের জন্য নিয়োগ করে তার সম্মতি ছাড়া তাকে অন্য কাজে নিয়োজিত করা জায়িয নেই (Al-Marghinānī, N.D., 3/293)।

৫. ব্যবসায় লভ্যাংশের মধ্যে অংশীদারকরণ

বর্তমান প্রগতিশীল প্রত্যেক রাষ্ট্র নিজেদের কল্যাণকামী রাষ্ট্র রূপে দাবি করে থাকে। অন্যদিকে দুনিয়ার সব দেশের চাকুরীজীবী/ মজদুরশ্রেণি সম্মিলিত হয়ে

কঠিন আন্দোলন করে রাষ্ট্রসমূহকে বাধ্য করছে ব্যবসায় লভ্যাংশের মধ্যে তাদেরও অংশীদার করতে হবে। অথচ রাসূলুল্লাহ স. ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার পর প্রথম দিন থেকে এ অধিকার দিয়ে দিলেন যে, মজদুর শ্রেণি ব্যবসায় লভ্যাংশে শরীক হতে পারবে। এ জন্যেই ইসলাম মুদারাবা (অংশীদারী ব্যবসা) এবং মুযারাআহ (বর্গাচাষ)-এর মত অংশীদারিত্বমূলক বিধানের প্রচলন করেছে। রাসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেছেন:

أَعْطُوا الْعَامِلَ مِنْ عَمَلِه فَإِنَّ عَامِلَ اللَّه لا يَخِيبُ.

শ্রমিকদেরকে তাদের শ্রমার্জিত সম্পদ (লাভ) হতেও অংশ দিও। কারণ আল্লাহর মজুরকে বঞ্চিত করা যায় না (Ibn Hanbal, 2001, 8604)।

রাসূলুল্লাহ স. আরো বলেন:

إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِه، فَإِنْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ، فَلْيُنَاوِلْهُ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ أَوْ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ، فَإِنَّهُ وَلِيَ عِلاَجَهُ.

যখন তোমাদের মধ্যে কোন খাদেম খাবার নিয়ে আসে, আর খাবার খাওয়ার সময় যদি কোন কারণে তাকে সাথে বসাতে না পার, তবে তার হাতে এক মুঠো বা দু মুঠো অবশ্যই তুলে দিবে। কারণ সে কষ্ট করে খাবার তৈরি করেছে (Al-Bukhārī, 1304H, 2557)।

এ হাদীসের মধ্যে **فَإِنَّهُ وَلِيَ عِلاَجَهُ** কথাটি এমন বাস্তবতার দিকে ইশারা করে যে, তাকে খাবারে শরীক করার কারণ এই যে, তোমাদের মাল এবং তার মেহনত মিলে এ খানা তৈরি হয়েছে। সুতরাং তাকেও তার তৈরিকৃত খানার মধ্যে শরীক করে নাও। এ হাদীস দ্বারা আরো একটি বিষয় স্পষ্ট হয় যে, তার পরিশ্রমের দ্বারা তৈরি করা খানার মধ্যে তার অংশ গ্রহণ তার বেতনের বাইরে হবে। কারণ খাদেম বা চাকরকে শুধুমাত্র এক দু'গ্রাস খানা দিয়েই তার মেহনতের পারিশ্রমিক পরিশোধ করা যায় না।

শ্রমিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য

ইসলাম মালিকের উপর শ্রমিকের প্রতি যেমন দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারণ করেছে, তেমনি শ্রমিকের উপর মালিকের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য আরোপ করেছে। শুধু মালিক তার দায়িত্ব সম্পাদন করলেই সুসম্পর্ক গড়ে ওঠবে না। পক্ষান্তরে শ্রমিকেরও স্বীয় দায়িত্ব যথাযথভাবে সম্পাদন করতে হবে। ইসলাম উভয়কেই স্বীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে সম্পন্ন করার প্রতি জোর তাগিদ দিয়েছে। নিম্নে শ্রমিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য বিষয়ে আলোকপাত করা হলো:

১. কাজ বা পেশায় দক্ষতা অর্জন

কাজে দক্ষতা অর্জন ছাড়া সফলতা সম্ভব নয়। শ্রমিকের সর্বপ্রথম দায়িত্ব হলো নিজেকে সুদক্ষ ও সুযোগ্য করে গড়ে তোলা এবং মালিকের কাজ অত্যন্ত দক্ষতার

সাথে সম্পাদন করা। নবী স. মজদুরদেরকে এ বিষয়ে বিশেষভাবে তাগিদ দিয়েছেন যে, তারা যখন কোন কাজ করে তা যেন অত্যন্ত দক্ষতার সাথে আঞ্জাম দেয়। যেন মালিকের কাজ খুব ইনসাফের সাথে সমাধা হয়। রাসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেছেন:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتْقِنَهُ.

নিশ্চয় আল্লাহ্ তাআলা পছন্দ করেন যে, তোমাদের মধ্য থেকে যখনই কেউ কোন কাজ করে, তবে সে যেন উক্ত কাজ খুব দক্ষতার সাথে করে (Al-Musilī, 1984, 4386; Al-Hindī, 1989, 9128)।

২. আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে কার্য সম্পাদন

মজদুরের জন্য এটা অত্যন্ত জরুরী যে, যখন সে কোন কাজের পারিশ্রমিক নেয়, তখন সেই কাজ যেন সে অত্যন্ত আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে সম্পাদন করে। কাজের দায়িত্ব গ্রহণের পর সে যেন কোন ধরনের ফাঁকি বা গাফলতি করার চেষ্টা না করে। কেননা কাজে ফাঁকি দেয়া শরীয়তের দৃষ্টিতে জঘন্য অপরাধ। আল্লাহ তাআলার বাণী:

﴿ وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴾

মন্দ পরিণাম তাদের জন্য-যারা মাপে কম দেয়, যারা লোকের নিকট থেকে মেপে নেয়ার সময় পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করে এবং যখন তাদের জন্য মেপে অথবা ওজন করে দেয়, তখন কম দেয় (Al-Qura'n: 83: 1-3)।

মুফাসসিরগণের মতে আয়াতের মধ্যে মাপে কম-বেশি করার ভাবার্থে ঐ সব মজুরকেও শামিল করা হয়েছে, যারা নির্ধারিত পারিশ্রমিক পুরোপুরি উসূল করে এবং কাজে গাফলতি প্রদর্শন করে (Shafī', 1413H, 1442)।

মালিকের কাজ যথাযথভাবে সম্পাদন করা শ্রমিকের কর্তব্য। এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ স. বলেন:

إن الله تعالى يحب من العامل إذا عمل أن يحسن.

নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা মজুরের জন্যে পছন্দ করেন, যখন সে কোন কাজ করে তা যেন উত্তমরূপে সম্পাদন করে (Al-Hindī, 1989, 9129)।

৩. সততা ও আমানদারী রক্ষাকরণ

শ্রমিকের আরেকটি মৌলিক দায়িত্ব হচ্ছে, মালিকের কাজে শতভাগ সততা ও আমানতদারী বজায় রাখা। যেমন কুরআন মজীদে এ দিকে ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে:

﴿ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأَمِينُ ﴾

তোমার মজুর হিসেবে উত্তম হবে সেই ব্যক্তি, যে শক্তিশালী, বিশ্বস্ত (Al-Qura'n: 28: 26)।

মহানবী স. অত্যন্ত জোর দিয়ে বলেছেন, শ্রমিকরা যেন কোন অবস্থায় সততা ও আমানতদারীর কথা ভুলে না যায়। আধুনিক যুগে এ আলোকিত শিক্ষার প্রতি চরম অবহেলা দেখানো হচ্ছে, যার প্রভাবে পার্থিব এ চরম উন্নতির যুগেও মালিক-শ্রমিকের মাঝে অমানবিক লড়াই-সংঘাত লেগেই রয়েছে। মহানবী স. শ্রমিকদেরকে বিশেষভাবে সতর্ক করেছেন, তারা যেন মালিকের মালের কোন প্রকার খেয়ানত ও আত্মসাৎ না করে। এমনকি ঘুষ গ্রহণের কোন পন্থা সৃষ্টি না করে। মহানবী স. ইরশাদ করেছেন:

مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ وَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا، فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ.

যদি কোন ব্যক্তি আমাদের নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে নির্দিষ্ট পারিশ্রমিকের অতিরিক্ত গ্রহণ করে, তবে সেটা আত্মসাৎ হবে (Al-Baihaqī, 2003, 13020)।

৪. মালিকের মালের হিফাজতকরণ

শ্রমিক যে প্রতিষ্ঠান বা কারখানায় কাজ করবে সেখানকার যাবতীয় যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের রক্ষণাবেক্ষণ করা তার নৈতিক দায়িত্ব। মালিকের এ সকল যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম নিজের মনে করতে হবে। কেননা এগুলো দিয়েই সে তার জীবিকা নির্বাহ করে। এগুলোতে কোন প্রকার ক্ষতিসাধন করলে আমানতের খিয়ানত হিসেবে গণ্য হবে। কারণ মালিক কারখানার যাবতীয় জিনিসপত্র তার দায়িত্বে অর্পণ করেছে। তাই মালিকের যাবতীয় সম্পদ তার কাছে আমানত স্বরূপ। এই আমানত রক্ষা করা তার ঈমানী দায়িত্ব। আল্লাহ তাআলা সব ধরনের আমানতের খেয়ানত করাকে নিষিদ্ধ করেছেন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

হে ঈমানদারগণ! তোমরা জেনে শুনে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলুল্লাহ স.-এর সাথে বিশ্বাস ভঙ্গ করবে না, আর তোমাদের পরস্পরের গচ্ছিত দ্রব্য সম্পর্কেও বিশ্বাসঘাতকতার প্রশ্রয় দিবে না (Al-Qura'n: 8: 27)।

মালিকের ব্যবসায়িক সম্পদ শ্রমিকের কাছে ঋণস্বরূপ ধরে নেয়া হবে। সুতরাং শ্রমিক এতে কোন প্রকার ক্ষতিসাধন করলে শরীয়তের দৃষ্টিতে শ্রমিকের উপর জরিমানা সাব্যস্ত হবে।

৫. নিয়মানুবর্তিতা

মালিকের যাবতীয় নিয়ম-কানুনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা শ্রমিকের একান্ত কর্তব্য। মালিক যখন যা নির্দেশনা দেয় শ্রমিকের তা অবশ্যই পালন করতে হবে। নিয়ম-

নীতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন না করলে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে এবং উৎপাদন কর্মকাণ্ড ব্যাহত হবে। ফলে মালিক ও শ্রমিক উভয়ই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তবে যদি মালিক অন্যায় বা শরীয়ত পরিপন্থী নিয়ম-নীতি প্রবর্তন করে বা কোন নির্দেশনা জারি করে, শ্রমিক তা মানতে বাধ্য নয়। বরং এ ব্যাপারে আনুগত্য প্রদর্শন করা সম্পূর্ণ শরীয়ত বিরুদ্ধ কাজ। এ ব্যাপারে নবী স. ইরশাদ করেন:

السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلا سَمْعَ وَلا طَاعَةَ.

যে যাবত কোন অন্যায় কাজের আদেশ না দেয়া হয়, তবে মুসলিম ব্যক্তির তার উর্ধ্বতনের নির্দেশ শোনা এবং আনুগত্য করা কর্তব্য; বিষয়টি তার পছন্দ বা অপছন্দ হোক। তবে যখন গোনাহ বা অন্যায় কাজের আদেশ দেয়া হয়, তখন শোনা ও আনুগত্য প্রদর্শন করা যাবে না (Al-Bukhārī, 1304H, 7144; Al-Tirmidī, 1304H, 1704)।

৬. গোপনীয়তা রক্ষাকরণ

শ্রমিকের আরেকটি কর্তব্য হচ্ছে মালিকের গোপনীয়তা রক্ষা করা। মালিক তার শিল্প প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে কৌশলগত কারণে অনেক বিষয় গোপন রাখতে চায়। শ্রমিককে সে সকল বিষয়ের গোপনীয়তা রক্ষা করা নৈতিক দায়িত্ব। কেননা কিছু কিছু বিষয় এমন রয়েছে যা প্রকাশ পেলে মালিক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভবনা থাকে। অন্যদিকে গোপনীয় বিষয় প্রকাশ করা এক ধরনের খিয়ানত, যা শরীয়তের দৃষ্টিতে মারাত্মক অপরাধ। রাসূলুল্লাহ স. এ ব্যাপারে ইরশাদ করেন:

كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ

মানুষের জন্য মিথ্যা হিসেবে এটাই যথেষ্ট যে, সে যা শুনে তা বলে দেয় (Muslim, N.D., 2309)।

কাযী আবুল হাসান আল-মাওয়ার্দী [৩৬৪-৪৫০ হি.] রহ. বলেন,

اعلم أن كتمان الأسرار من أقوى أسباب النجاح و أدوم لأحوال الصلاح

জেনে রাখ! নিশ্চয় গোপনীয়তা রক্ষা করা সফলতার সবচেয়ে শক্তিশালী উপাদান এবং শান্তিপূর্ণ অবস্থার দীর্ঘস্থায়ী উপায় (Al-Māwardī, 1978, 295)।

আবার কারো গোপনীয়তা প্রকাশ করা তার সাথে প্রতারণার শামিল। যে প্রতারণা করে ইসলামের দৃষ্টিতে সে মুমিন হিসেবে গণ্য নয়। যেমন নবী স. বলেন,

من غش فليس منا

যে প্রতারণা করে সে আমাদের দলভুক্ত নয় (Al-Tirmidī, N.D., 72)।

মালিক শ্রমিকের সম্মিলিত দায়িত্ব ও কর্তব্য

এ পরিসরে কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে, যা মালিক-শ্রমিক উভয়ের সাথে সম্পৃক্ত। উভয়কেই সেই দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলো যথাযথভাবে পালন করতে হবে। যদি উভয়েই সেগুলোর প্রতি যত্নবান হয়, তাহলে তাদের মাঝে আপনা আপনিভাবে সদ্ভাব ও সম্প্রীতি গড়ে ওঠবে। নিম্নে এই বিষয়গুলোর আলোচনা উপস্থাপিত হলো:

১. সদাচরণ

পরস্পর একে অন্যের প্রতি সদাচরণ করা মালিক-শ্রমিক উভয়ের জন্যেই অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক সদ্ভাব ও আন্তরিকতা না থাকলে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড দারুণভাবে বাধাগ্রস্ত হবে। কুরআনুল কারীমের মধ্যে সদাচরণের ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

﴿وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾

তোমরা আল্লাহ তাআলার পথে ব্যয় কর এবং স্বীয় হস্ত ধ্বংসের দিকে প্রসারিত করো না। আর হিতসাধন করতে থাক। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা হিতসাধনকারীকে ভালবাসেন (Al-Qura'n: 1: 195)।

উক্ত আয়াতে সাধারণভাবে সদাচরণের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। তাই সকলের প্রতি সদাচরণ করতে হবে। বিশেষত মালিক-শ্রমিকদের ক্ষেত্রে এ বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ মালিকরা শ্রমিকদেরকে ভৃত্য মনে করে তাদের সাথে যাচ্ছেতাই আচরণ করে। ফলে উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব-বিসংবাদ সৃষ্টি হয়।

রাসূলুল্লাহ স. খাদেমদের সাথে কতটা মেহেরবান এবং দরদী ছিলেন এবং তাদের সাথে কতটা সদাচরণ করতেন, সেটা আনাছ রা.-এর বর্ণনা থেকে স্পষ্ট হয়ে যায়। তিনি বর্ণনা করেন:

خَدَمْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ سِنِينَ، وَاللهِ مَا قَالَ لِي: أُفًّا قَطُّ، وَلا قَالَ لِي لِشَيْءٍ: لِمَ فَعَلْتَ كَذَا؟ وَهَلَّا فَعَلْتَ كَذَا؟

আমি দশ বছর রাসূলুল্লাহ স.-এর খেদমত করেছি। কিন্তু তিনি কোন দিন আমাকে সামান্যতম তিরস্কার করে এ কথা বলেননি যে, আনাছ! তুমি এটা কেন করলে এবং এটা কেন করলে না? (Muslim, N.D., 2309)

অনুরূপভাবে শ্রমিকদেরকেও মালিক ও অন্যান্য সহকর্মীদের সাথে ভাল আচরণ করতে হবে এবং তাদের হিত কামনা করতে হবে।

রাসূল স. বলেন:

خير الأصحاب عند الله خيره لصاحبه وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره.

আল্লাহর নিকট সর্বোত্তম সঙ্গী সেই, যে তার সাথীর নিকট সর্বোত্তম এবং সর্বোত্তম প্রতিবেশী সেই যে তার প্রতিবেশীর নিকট সর্বোত্তম (Al-Tirmidī, N.D., 1944)।

২. অঙ্গীকার পূরণ

মালিক-শ্রমিক উভয়েই পারস্পরিক কাজের দায়িত্ব নিয়ে একটি নৈতিক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। চুক্তিপত্রে কৃত অঙ্গীকার উভয়ের জন্যেই যথাযথভাবে পূরণ করা একান্ত জরুরী। সত্যিকারার্থে তাদের কৃত অঙ্গীকার পালনের মাধ্যমেই পারস্পরিক সৌহার্দ্য স্থাপিত হয়। অন্যথায় এ কারণেই পারস্পরিক সম্পর্ক তিক্ততায় পর্যবসিত হয়। অঙ্গীকার পূর্ণ করার ব্যাপারে কুরআনুল কারীমে বর্ণিত হয়েছে:

﴿ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولا ﴾

তোমরা প্রতিশ্রুতি পালন করবে। প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করা হবে (Al-Qura'n: 17: 34)।

প্রতিশ্রুতি পালনের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ স. স্পষ্ট তাগিদ দিয়েছেন। স্বাভাবিক অঙ্গীকার রক্ষা করার ক্ষেত্রে যতগুলো হাদীস বর্ণিত হয়েছে, সেসব হাদীস মালিক-শ্রমিকের অঙ্গীকার রক্ষার সনদরূপে পরিগণিত হয়। এখানে কারবার সম্পর্কিত একটি হাদীস উভয়ের শিক্ষণীয় বিষয় হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْحَمْسَاءِ، قَالَ: بَايَعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَيْعٍ قَبْلَ أَنْ يُبْعَثَ وَبَقِيَتْ لَهُ بَقِيَّةٌ فَوَعَدْتُهُ أَنْ آتِيَهُ بِهَا فِي مَكَانِه، فَنَسِيتُ، ثُمَّ ذَكَرْتُ بَعْدَ ثَلاث، فَجِئْتُ فَإِذَا هُوَ فِي مَكَانِه، فَقَالَ: «يَا فَتَى، لَقَدْ شَقَقْتَ عَلَيَّ، أَنَا هَاهُنَا مُنْذُ ثَلاث أَنْتَظِرُكَ.

আব্দুল্লাহ ইবনু আবিল হামসা রা. বলেন, নবী স.-এর নুবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বে তার থেকে আমি কিছু বস্তু খরিদ করেছিলাম। যার কিছু অর্থ বাকি ছিল এবং সে অর্থ আমি উক্ত স্থানে নিয়ে আসার ওয়াদা করেছিলাম, ঘটনাক্রমে আমি তা ভুলে গিয়েছিলাম। তিন দিন পর আমার স্মরণ হতেই আমি সেখানে ছুটে গেলাম এবং দেখতে পেলাম, নবী সা. সে স্থানেই বসে আছেন। তিনি আমাকে দেখে শুধু এতটুকু বললেন যে, তুমি আমাকে কষ্ট দিলে। তোমার জন্য আমি এখানে তিন দিন যাবত অপেক্ষায় রয়েছি (Abū Da'ūd, N.D, 4996)।

৩. ক্ষয়ক্ষতির বিধান

উৎপাদনে কোন প্রকার ঘাটতি দেখা দিলে বা সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি হলে সে ক্ষেত্রেও ইসলাম ন্যায়ানুগ বিধান দিয়েছে। মালিক বা শ্রমিক ইচ্ছাকৃতভাবে কেউ কারো ক্ষতি

সাধন করলে ইসলামের দৃষ্টিতে ক্ষতিপূরণের বিধান ক্ষতিসাধনকারীর উপর বর্তাবে। অর্থাৎ মালিক যদি শ্রমিকের কোন প্রকার ক্ষতিসাধন করে, তাহলে তা মালিককেই বহন করতে হবে এবং তা জুলুম হিসেবে গণ্য করা হবে। অনুরূপভাবে শ্রমিক যদি মালিকের কোন ক্ষতিসাধন করে, তাহলে তা শ্রমিকের উপর বর্তাবে এবং তা আত্মসাৎ হিসেবে গণ্য হবে। রাসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন:

أهدت بعض أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم طعاما في قصعة فضربت عائشة القصعة بيدها فألقت ما فيها فقال النبي صلى الله عليه وسلم طعام بطعام وإناء بإناء.

নবী স. এর কাছে তাঁর কোন এক স্ত্রী একটি থালায় করে কিছু খাবার হাদিয়া পাঠান। আয়িশা রা. তাতে হাত দিয়ে আঘাত করেন। ফলে থালায় যা ছিল তা পড়ে যায়। তখন নবী স. বললেন, খাবারের বদলে খাবার এবং একটি পাত্রের বদলে আরেকটি পাত্র (Al-Tirmizī, N.D. 1359)।

উপর্যুক্ত হাদীসে ক্ষতিপূরণের স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। সুতরাং যে ব্যক্তি অন্যের মালিকানাধীন সম্পদে নিজের হাত বাড়ায় এবং অনুমতি ছাড়া জোরপূর্বক তা হরণ বা ধ্বংস করে ফেলে এর ক্ষতিপূরণ তাকেই বহন করতে হবে। অন্যত্র রাসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেছেন:

على اليد ما أخذت حتى تؤدى.

হাত দিয়ে যা গ্রহণ করেছে তা তাকেই নিতে হবে, যতক্ষণ সে তা ফেরত না দেয় (Al-Tirmidī, N.D. 1266)।

জোরপূর্বকভাবে হস্তগত বস্তুর ক্ষেত্রে এটিই ইসলামের মূলনীতি। ফিকহবিদদের পরিভাষায় এটাকে বলা হয় গছব বা আত্মসাৎ। সুতরাং মালিক-শ্রমিক উভয়কে পরস্পর একে অন্যের মালের সংরক্ষণ করতে হবে। যদি এ ক্ষেত্রে কোন ধরনের খিয়ানত পরিলক্ষিত হয়, তবে উক্ত বিধানের আলোকে খিয়ানতকারীকে এর দায়-দায়িত্ব নিতে হবে।

সরকারের দায়িত্ব

এ ক্ষেত্রে ইসলাম মালিক-শ্রমিকের পাশাপাশি সরকারেরও কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারণ করে দিয়েছে। সরকার যখন স্বীয় ভূমিকা পালন করবে, তখন মালিক-শ্রমিকের জন্য স্ব স্ব দায়িত্ব সম্পাদন করা সহজতর হবে। নিম্নে সরকারের দায়িত্বগুলোর বিষয়ে আলোকপাত করা হলো:

১. সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিতকরণ

সরকারের প্রধান দায়িত্ব হলো এমন পরিবেশ নিশ্চিত করা, যেখানে সবার অধিকার সংরক্ষিত থাকবে। অধিকার আদায়ের জন্য যেখানে কোন ধরনের দাবি পেশ করার

অবকাশ থাকবে না। প্রত্যেকেই চাওয়ার আগেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে প্রত্যেকের অধিকার আদায়ে সচেষ্ট থাকবে। যদি কেউ কারো অধিকার ক্ষুণ্ন করে, তাহলে সরকার সে অধিকার আদায়ের ব্যাপারে দায়বদ্ধ থাকবে। এমনটিই ইসলামের মৌলবিধান। যেমন রাসূল স. ঘোষণা করেছেন:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالأَمِيرُ رَاعٍ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেকেই স্বীয় দায়িত্বের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। শাসনকর্তা দায়িত্বশীল, পুরুষ তার পরিবারবর্গের ব্যাপারে দায়িত্বশীল এবং স্ত্রী তার স্বামীর ঘর ও তার সন্তানদের ব্যাপারে দায়িত্বশীল। অতএব, তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তোমরা প্রত্যেকেই স্বীয় দায়িত্বের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে (Al-Bukhārī, 1304H, 5200)।

২. আইনের অনুশাসন

একটি শ্রম নীতিমালা প্রণয়ন করে মালিক-শ্রমিক উভয়ের স্বার্থ সংরক্ষণ করা এবং এর পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রয়োগ নিশ্চিত করা সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। শ্রম নীতিমালা প্রণয়নের ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে, যেন কোনভাবেই কেউ ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। কারণ ইসলামের মৌলনীতি হচ্ছে নিজে ক্ষতিগ্রস্ত না হওয়া এবং অন্যকে ক্ষতিগ্রস্ত না করা। যেমনটি হাদীসে উল্লেখ রয়েছে। নবী স. ইরশাদ করেন:

لا ضرر ولا ضرار

নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া যাবে না এবং অন্যকেও ক্ষতিগ্রস্ত করা যাবে না (Ibn Mājah, D.N., 2341)।

শ্রম নীতিমালা প্রণয়নের পাশাপাশি সরকারকে তা যথাযথ বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজনে এ ক্ষেত্রে কঠোর নীতি অবলম্বন করতে হবে। যদি মালিক-শ্রমিকদের কেউ এই বিধান পালনে অসম্মতি জ্ঞাপন করে অথবা কোন বিধির বরখেলাপ করে, তবে সরকার এ ক্ষেত্রে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করবে।

৩. ভাতা ও আর্থিক নিরাপত্তা বিধান

শ্রমিক বৃদ্ধ বা অসুস্থ হয়ে গেলে তার জীবিকা নির্বাহের আর কোন উপায় থাকে না। কারণ শ্রমই তার একমাত্র পুঁজি। খাদ্যের জন্য শ্রমিক জীবনের সকল শক্তি-সামর্থ্য ব্যয় করে আজ সে নিঃস্ব ও অসহায় অথচ মালিকগণ ভুলেও তার দৈন্যদশার দিকে তাকায় না। শ্রমিক সারা জীবন কায়িক পরিশ্রম দিয়ে যেরূপ মালিকের মুনাফা অর্জনে সহযোগিতা করেছে তদ্রুপ মালিকও শ্রমিকের জীবন সায়াহ্নে মৌলিক চাহিদাগুলো

পূরণ করে তার নিরাপত্তা বিধান করবে। সরকারের দায়িত্ব হলো, মালিকের পক্ষ থেকে শ্রমিকের এই অধিকারগুলো নিশ্চিত করা। অথবা সরকার এই অসহায় লোকদের দায়িত্ব গ্রহণ করবে এবং রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে তাদের প্রয়োজন পূরণ করবে। প্রয়োজন অনুপাতে তাদের জন্য ভাতা নির্ধারণ করে তাদের সামাজিক নিরাপত্তা বিধান করবে। যেমন রাসূল স. ইরশাদ করেছেন:

أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً فَعَلَيْنَا قَضَاؤُهُ وَمَنْ تَرَكَ مَالا فَلِوَرَثَتِه.

আমি মুমিনদের প্রতি তাদের নিজেদের চেয়েও বেশি দায়িত্ববান। অতএব, তাদের কেউ যদি এমন ঋণ রেখে মারা যায়, যা শোধ করার সামর্থ্য তার ছিল না, তাহলে তা শোধ করার দায়িত্ব আমার (তথা মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধানের)। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি সম্পদ রেখে মারা যায়, সে সম্পদের ভাগী হবে তার ওয়ারিসগণ (Al-Bukhārī, 1304H, 6731)।

রাসূলুল্লাহ স. আরো ইরশাদ করেছেন:

مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِه وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا فَإِلَيْنَا.

কেউ মাল রেখে মারা গেলে তার ওয়ারিসগণ এই মালের অধিকারী হবে। আর যদি কেউ অসহায় লোক রেখে যায়, তাহলে তার দায়-দায়িত্ব আমাদের। অর্থাৎ সরকারের উপর (Al-Bukhārī, 1304H, 6731)।

৪. সামাজিক নিরাপত্তা বিধান

মানুষের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান ও চিকিৎসার মত মৌলিক অধিকারগুলো ইসলাম অতি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেছে। সরকারের অন্যতম দায়িত্ব হচ্ছে শ্রমিকদের এই মৌলিক অধিকারগুলো নিশ্চিত করে তাদের সামাজিক নিরাপত্তা বিধান করা। কেননা, শ্রমিক সম্প্রদায় তাদের মৌলিক প্রয়োজনগুলো আদায়ের ব্যাপারে নিশ্চয়তা না পেলে কাজে মনোযোগী হতে পারবে না। তাতে মালিকদের উৎপাদন কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হবে। সার্বিকভাবে দেশের উন্নয়ন ব্যাহত হবে। তাই সরকার মালিকদের কাছ থেকে শ্রমিকদের সকল অধিকার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। পাশাপাশি একজন নাগরিক হিসেবে সর্বাগ্রে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে তাদের পাওনাগুলোর ব্যাপারে বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। যেমন উমর রা. অসুস্থ কর্মচারীদের সেবা-শুশ্রূষা ও চিকিৎসা হচ্ছে কিনা এর খোঁজ-খবর নিতেন। কেউ এ কর্তব্য পালনে অবহেলা করলে তাকে পদচ্যুত করতেন (IFA, 2013, 501)।

বাংলাদেশে মালিক-শ্রমিক দ্বন্দ্ব নিরসনে কতিপয় সুপারিশ

১. **পারস্পরিক দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচককরণ:** মালিক-শ্রমিকদের পারস্পরিক দৃষ্টিভঙ্গি ইতিবাচক করতে হবে। মালিকদের শ্রমিকদের প্রতি দাস-

দাসীসুলভ দৃষ্টিভঙ্গি পরিহার করতে হবে। পক্ষান্তরে শ্রমিকদেরকেও মালিকদেরকে প্রতিপক্ষ না ভেবে বন্ধুসুলভ দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করতে হবে। পারস্পরিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করতে পারলে উভয়ের মধ্যকার অনেক বিরোধ আপনা আপিনভাবেই নিষ্পত্তি হয়ে যাবে।

২. **ন্যায্য মজুরি নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন:** বাংলাদেশে শ্রমিক আন্দোলনের মূল কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে ন্যায্য মজুরির দাবি। তাই এই বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে। সরকারকে এ লক্ষ্যে একটি মজুরি বোর্ড গঠন করে একটি ন্যায্য মজুরি নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে। এই মজুরি কাঠামো প্রতি তিন বা চার বছর অন্তর অন্তর অথবা প্রতিবছর মূল্যস্প্রীতির হার অনুযায়ী সরকারি পে-স্কেলের ন্যায় পর্যালোচনা করে পুনর্নির্ধারণ করতে হবে। পাশাপাশি সরকারকে মালিকদের এই নীতিমালা পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসরণে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

৩. **আইনের কঠোর বাস্তবায়ন:** মালিক-শ্রমিকদের স্বার্থ সংরক্ষণের লক্ষ্যে ২০০৬ সালে বাংলাদেশ শ্রম আইন নামে একটি শ্রম নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। কিন্তু এর যথাযথ বাস্তবায়ন নেই। সরকারকে এই শ্রম আইন যথাযথ বাস্তবায়ন করতে হবে। প্রত্যেক মালিক ও শ্রমিককে এই আইন যথাযথভাবে পালনে বাধ্য করতে হবে। আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীকে এ বিষয়ে আরো তৎপর হতে হবে এবং আইন লংঘনকারীর শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে।

৪. **চাকুরীর নিশ্চয়তা বিধান:** নানা অজুহাতে শ্রমিক ছাঁটাইয়ের যে সংস্কৃতি গড়ে ওঠেছে তা সম্পূর্ণরূপে পরিহার করতে হবে। সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ন্যায় একটি বিধিমালার মাধ্যমে শ্রমিকদেরকেও চাকুরি স্থায়ীকরণের নিশ্চয়তার বিধান করতে হবে। চাকুরীর বয়সসীমা নির্ধারণ করে তাদের এ সম্পর্কীয় যাবতীয় সুবিধা প্রদান করতে হবে।

৫. **ওভারটাইম ও বোনাস নিশ্চিতকরণ:** উৎসবকালীন বোনাসগুলো এবং ওভারটাইম ভাতা যথাযথভাবে নিশ্চিত করতে হবে। ঈদের সময় বেতন-বোনাস নিয়ে অনেক কারখানার মালিক বিভিন্ন টালবাহানা করে থাকে। পাশাপাশি ওভারটাইম ভাতা নিয়েও গড়িমসি করে। একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালার আলোকে শ্রমিকদের এই অধিকারগুলো নিশ্চিত করতে হবে।

৬. **মানসম্মত কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণ:** স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ নিশ্চিত করা শ্রমিকের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কাজ করে শ্রমিকরা নানান শারীরিক ও মানসিক সমস্যায় নিপতিত হয়। তাই শ্রমিকদের জন্য মানসম্মত কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে।

উপসংহার

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন আন্দোলনের মাধ্যমে মজদুর শ্রেণির স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য যে প্রচেষ্টা চলছে তা কোনভাবেই ফলপ্রসু হচ্ছে না। বরঞ্চ দ্বন্দ্ব-বিসংবাদ দিনে দিনে বেড়েই চলছে। তাই ইসলামের বিধানের আলোকেই কেবল আজকের প্রগতিশীল দুনিয়াতে মালিক-শ্রমিকের মধ্যে সৃষ্ট অনাকাঙ্ক্ষিত দ্বন্দ্ব-সংঘাতের অবসান করা সম্ভব। এমনিভাবে এ শিক্ষার আলোকে রাষ্ট্রীয়ভাবে সৃষ্ট অসংখ্য সমস্যার শান্তি পূর্ণ সমাধান হতে পারে। আজ সময় এসেছে গভীরভাবে অনুধাবন করার, ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ চলমান এ বিশ্বে শান্তির আবেহায়াত সৃষ্টি করতে হেরার রাজ তোরণই অদ্বিতীয় ঠিকানা। যত সত্বর আমরা এ ছোট্ট কথাটি বুঝে নেব, তত শীঘ্রই আমাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হবে।

গ্রন্থপঞ্জিঃ

Al-Qura'n

Abū Dā'ūd, Al-Hāfiz Abū Dā'ūd Sulaiman Ibn Al-Ash'as. N.D. *Al-Sunan.* Beirut: Al-Maktaba al-'Asriyyah al-'Arabiyyah.

Ahmad, Ibn Hanbal. 2001. *Al-Musnad.* Beirut: Muassasah al-Risālah.

Al-Bahūtī, Mansūr Ibn Younus. N.D., *Sharhu Muntah al- Irādāt.* Beirut: Dār al-Fikr.

Al-Baihaqī, Abū Bakr Ahmad Ibn Al-Hossain Ibn 'Ali Ibn Mūsa. 2003. *al-Sunan al-Kubra*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Bukhārī, Abu 'Abdullah Muhammad Ibn Isma'il. 1304H. *Al-Jami' al-Sahīh,* Cairo: Maktabah al-Khairiyyah.

Al-Gilānī, Manajir Ahsan. 1926. *Islami Ma'ashiyyat.* Delhi: Shaikh Golam Ali Publications.

Al-Hindī, 'Ali Ibn Hisāmuddin Al-Mutāqi. 1989. *Kanz Al-'Ummāl*. Beirut: Muassasah al-Risālah.

Al-Margīnānī, Burhanuddin. N.D. *Al-Hidāyah*. Egypt: Al-Maktaba al-Islamiyyah.

Al-Māwardī, 'Ali Ibn Muhammad Ibn Habib. 1978. *Adab al-Dunyā wa al-dīn.* Beirut, Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Mawsilī, Abū Ya'lā Ahmad Ibn 'Ali Ibn Al-Musanan. 1984. *Musnad Abū Ya'lā.* Damascus: Dār al-Māmūn al-Turāth.

Al-Tirmidī, Abū 'Isa Muhammad Ibn 'Isa. N.D., Al-*Sunan*. Beirut: Dār al-Ihya al-turāth al-'Arabī.

Bangladesh Protidin, Jan. 01, 2015.

Haque. Muhammad Enamul (edited). 2011. *Bangla Academy Byabaharik Bangla Abhidhan.* Dhaka: Bangla Academy.

https://en.wikipedia.org/wiki/International_workars%27-Day, Last moditied on 28 Fed 2017, retrieved on 5th March, 2017.

Ibn Mājah, Al-Hafiz Abū 'Abdullah Muhammad Ibn Yazīd. D.N., *Al-Sunan.* Dār Ihya al-Kutub al-'Arabiyyah.

Ibn Qudāmah, Muwāfaq al-Dīn 'Abdullah Ibn Ahmad. 1968. *Al-Mughnī*. Cairo: Maktabah al-Qāhirah.

IFA. 2013. *Dainandin Zibane Islam.* Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh.

Maswood, Fareed Uddeen. 1982. *Islamey Shromiker Adhikar.* Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh.

Ministry of Laws Bangladesh. 2006. *The Bangladesh Labour Code.*

Muslim, Abū al-Hussain Muslim Ibn Al-Hajjāj. N.D., *Al-Musnad al-Sahīh*. Beirut: Dār al-Ihya al-turāth al-'Arabī.

Mustafa, Ibrahīm & others. 1989. *Al-Mu'jam al- Wasīt.*Istanbul: Dār al-da'wah.

Rahman, Muhammad Fazlur. 2009. *Al-Mu'jam al-Wāfī.* Dhaka: Riyadh Prakashani.

Siddiqi, Zillur Rahman (edited). 2005. *Bangla Academy Einglish-Bengali Dictionary.* Dhaka: Bangla Academy.